রবীন্দ্রনাথ ও এলিয়ট

রবীন্দ্রপুত্র রথীন্দ্রনাথ ও এলিয়ট উভয়ের জন্ম ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, সুতরাং বয়সের বিচারে এলিয়ট রবীন্দ্রনাথের পুত্রতুল্য। প্রজন্মগত কারণে এই দুই কবির মানসগঠনে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যাবে, এটাই স্বাভাবিক।

'নবজাতক'(১৯৪০) কাব্যগ্রন্থের 'রোম্যান্টিক' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নির্দ্বিধচিত্তে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে তিনি 'রোম্যান্টিক' কবিই। অপর পক্ষে এলিয়টের মনে তীব্র বিরূপতা ছিল রোমান্টিকতার প্রতি। তাই তিনি 'Counter-romantic' কবিতা লিখতে চেয়েছিলেন। উভয় কবিই পরিণত বয়সের মনস্কতায় প্রত্যক্ষ করেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সেক্ষেত্রেও একের সঙ্গে অপরের দৃষ্টি কোণের তফাৎ লক্ষ করা যাবে। বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়াও উভয়ের কবিমানসে ভিন্নভাবে কাজ করেছে। পূর্বের আলোচনায় এ প্রসঙ্গের সামান্য উল্লেখ আছে। তবে রবীন্দ্রনাথ যে পাশ্চাত্য জগতের অতি আধুনিক কবিতার গতি-প্রকৃতি ও তৎ-সংক্রান্ত নানাবিধ আন্দোলনের খোঁজ-খবর রাখতেন না তা কিন্তু নয়। এলিয়টের প্রায় গুরুস্থানীয় পাউন্ডের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের ইতিহাসও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এও সত্য যে প্রাথমিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অনেকটা কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে নব আধুনিকতাকে বরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন — 'আধুনিকতার রাজ্যে সচেতন যাত্রা রবীন্দ্রনাথের শেষ-পর্যায়ের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য।'[১] অর্থাৎ তাঁকে চেষ্টাকৃত অর্জনের মাধ্যমে আধুনিক হতে হয়েছে, অপরপক্ষে এলিয়ট তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'Prufrock and Other observations'(1917) থেকে 'একবারেই এবং একেবারেই আধুনিক'।[২] সময়ের দিক থেকে উনিশ-শতকী ঐতিহ্যবোধ ও দেশগত দিক থেকে ঔপনিষদীয় ভারতীয় ঐতিহ্যকে রবীন্দ্রনাথ কখনোই সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে পারেননি। বলা ভাল তা তিনি ত্যাগ করতে চানওনি। কিন্তু মহাযুদ্ধের এক ধাক্কায় এলিয়টের কবিসত্তা উনিশ-শতকী, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ থেকে লক্ষণীয়ভাবে সরে এসেছিল। দেশগত ঐতিহ্য বলেও প্রকৃতপক্ষে এলিয়টের কিছু ছিল না।

রবীন্দ্রনাথকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবাই যায় না, আর দেশত্যাগী এলিয়টকে তাঁর দেশের ঐতিহ্যসূত্রে ভাবাই দুষ্কর। আসলে 'রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্য বর্জন করতে পারেননি, এলিয়ট ঐতিহ্য অর্জন করতে পারেননি।'[৩] জগন্নাথ চক্রবর্তীর এই সামান্য কথার গভীর তাৎপর্যের দিকটি ব্যাখ্যা করে বুঝবার অবকাশ আছে। ঐতিহ্য বর্জন করতে পারেননি বলেই, পাশ্চাত্য জগতের নবতম সাহিত্য-আন্দোলন সম্পর্কে পূর্ণ-অবহিত রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে এ সম্পর্কে অনেকটা সহিষ্ণু মনোভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও, নিজের সহযাত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন রবার্ট ব্রিজেস, স্টার্জ মুর, এলিস মেনেল, আর্নেস্ট রীজ কিংবা রবার্ট ট্রেভেলিয়ানকে - এঁরা সকলেই ছিলেন উনিশ-শতকী ভিক্টোরীয় ঐতিহ্যবোধের শেষ প্রতিনিধি এবং কেউই আধুনিক কাব্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

অপরপক্ষে ঐতিহ্য অর্জন করতে পারেননি বলেই, তৈরি করা ঐতিহ্যচেতনায় উদ্বেলিত হয়ে, বিশ্বনাগরিকত্ববোধের তাড়নায় বিশ্বের পুরাণ, শিল্প, সাহিত্যের অনুষঙ্গে এলিয়ট তাঁর কাব্যকে কণ্টকিত ও ভারাক্রান্ত করে তুলেছিলেন, বিপুল আয়োজনে। একই কারণে 'The Sacred Wood' গ্রন্থের 'Tradition and the Individual Talent' প্রবন্ধে ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকারের নতুন ব্যাখ্যা দিলেন এলিয়ট এবং সেই অনুসারে সেই সূত্রে নিজকাব্যে উদ্ধৃতিহীন অন্যের রচনাংশের প্রয়োগ অথবা নিজের মৌলিক কাব্য অবয়বে গ্রীক, ফরাসী, লাতিন, জার্মান প্রভৃতি ভিন্নভাষায় রচিত মূল কাব্যাংশের অকুণ্ঠ সহজ সংযোজন তাঁর কাছে অনুমোদনযোগ্য হয়ে উঠল। আমরা কি বলতে চাইছি, এলিয়টের কবিতার সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই বুঝবেন। সুতরাং এ দুই কবির তুলনা চলে না, যদি করতে হয় তো প্রতিতুলনাই করতে হবে। তার আগে বরং তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা খুঁজে দেখবার চেষ্টা করি এ দুই কবির ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সম্পর্কের ইতিহাস আদৌ উল্লেখযোগ্য ছিল কিনা। আমরা মনে করি রবীন্দ্রনাথের প্রতি এলিয়টের শীতল নীরবতা বিশেষ ব্যঞ্জনাপূর্ণ, তাই উল্লেখযোগ্য। এ নীরবতা ইচ্ছাকৃত হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়—'এলিয়টের এখন পর্যন্ত মুদ্রিত সমগ্র রচনায় কোথাও রবীন্দ্রনাথের

নাম নেই।'[৪] অথচ তথ্য ও প্রমাণ বলছে, এঁদের পারস্পরিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা ছিল। অন্তত একবার এ দুই কবির মিলন হয়েছিল, ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক উডের গৃহে। এলিয়ট তখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই দর্শনের ছাত্র :

> While Tagore was at Harvard in 1913, Professor and Mrs Wood invited a number of guests to their house to meet him : One was T.S.Eliot, who was a fellow student of mine (we both took Indian Philosophy).[৫]

এলিয়টের পাঠ্যবিষয়ে ছিল ভারতীয় দর্শন। রবীন্দ্রনাথও ভারতীয় দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা দেবার জন্যে সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বক্তৃতা দেন মোট চারটি।

১৯১৪ থেকে ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন এলিয়ট আর রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে বহুবার এদেশ ভ্রমণ করেছেন। কিন্তু এ দুই কবির সাক্ষাতের কোনো ইতিহাস রচিত হয়নি। তবে কি এলিয়ট রবীন্দ্রনাথকে ভুলে গিয়েছিলেন ? রবীন্দ্রনাথের ইংরিজি-সাহিত্য কর্মের সঙ্গে তাঁর কি কোনই পরিচয় ছিল না ? নাকি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এলিয়ট উৎসাহই বোধ করেননি ! শেষের কারণটি হওয়াই স্বাভাবিক। 'প্রতিক্ষণ' সংস্কৃতি সংখ্যা ১৩৯৫-এ প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথের এলিয়ট' শীর্ষক প্রবন্ধে বিকাশ চক্রবর্তী এ বিষয়ে কিছু মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন, যা থেকে স্পষ্ট বুঝে নেওয়া যাবে, নীরবতার মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এলিয়টের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে। এ আসলে তাঁকে এড়িয়ে চলা। উপরিউক্ত প্রবন্ধে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ আমরা যথাযথ সহকারে আমাদের মতো করে উপস্থাপিত করতে চাই -

১. খুবই সম্ভব রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এলিয়ট অবহিত ছিলেন রবীন্দ্রস্নেহধন্য যুবক নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মাধ্যমে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' ২য় খণ্ডের সূত্রে আমরা জানতে পারি যে কবিগুরু নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন হার্ভার্ডে, ১৯১৩ সালে

এবং পরবর্তীকালে তিনি তাঁকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। আর -

> এই রবীন্দ্রভক্ত যুবক ১৯১৩-১৪ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এলিয়টের সহপাঠী ছিলেন, শুধু সহাধ্যায়ী নয়, ঘনিষ্ঠ বন্ধুও। ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারি - মার্চ মাসে হার্ভার্ডে অনুষ্ঠিত জোসিয়া রয়েসের (Josiah Royce) বিখ্যাত সেমিনারের ("A Comparative study of various Types of Method") জন্য তরুণ এলিয়ট যে চারটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার মধ্যে একটি এলিয়টের বদলে সভায় পাঠ করেছিলেন তাঁর বন্ধু নরেন্দ্রনাথ, ১৭ মার্চ তারিখে। ... এলিয়ট-নরেন্দ্রনাথ পত্রাবলীর মধ্যে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ থাকার সম্ভাবনা খুবই বেশি।[৬]

দুঃখের বিষয় সে-সব পত্রাবলি এখনো অমুদ্রিতই রয়ে গেছে। এই দুই বন্ধুর পত্র-সমগ্র মুদ্রিত হলে রবীন্দ্র-এলিয়ট প্রসঙ্গে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে হয়তো বা।

২. এলিয়টের আর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক চার্লস উইবলি (১৮৫৯-১৯৩০)। এতোই ঘনিষ্ঠ যে এঁর মৃত্যুর পর ১৯৩১ সালে তাঁর সম্পর্কে এক পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে এলিয়টের মতো আবেগ-বিদ্বেষী কবিও এভাবে শুরু করেছিলেন -

> There is a peculiar difficulty, which I experience for the first time, in attempting an estimate of the literary work of a writer whom one remembers primarily as a friend.[৭]

এই উইবলি-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্ক বঙ্গ-ইঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ইনি রবীন্দ্রনাথের ইংরিজি রচনা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। ম্যাকমিলান কোম্পানির কাছে বই হিসেবে ছেপে বার করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি গচ্ছিত ছিল সে সম্পর্কে উইবলি ১৯১২-এর নভেম্বর মাসে এক রিপোর্টে জানান -

> Rabindra Nath is a real poet, and he has translated his own poems into beautiful English ....[৮]

> শেষায় সাংবাদিক উইবলি লন্ডন ম্যাকমিলানের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনার পাণ্ডুলিপি পাঠ করে তাঁর মতামত জানাতেন। এঁরই পরামর্শে ম্যাকমিলান কোম্পানি ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র ব্যবসায়িক সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৯১৩ সালে।[৯]

উইবলি রবীন্দ্রনাথের ইংরিজি রচনার 'Over production'ও তার গতিকর দিকটি সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। তাই 'The Hungry Stones and Other Stories' গ্রন্থের আসন্ন প্রকাশ সম্পর্কে আর এক রিপোর্টে তিনি মন্তব্য করেছিলেন - 'I confess that there seems a danger of Tagore's spoiling his own market by over production.'[১০] এটা ১৯১৬-র ঘটনা। বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবতে ইচ্ছে হয়, উইবলির সাহিত্যকর্ম ও সাংবাদিকতা বিষয়ে এক পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের লেখক টি.এস.এলিয়ট কি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর বন্ধুর এইসব বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অভিব্যক্তির কোনো খবরই রাখতেন না।

৩. রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা, নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৩২ সাল থেকে লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। যদিও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল, তবু এ তথ্য ফেলে দেবার মতো নয় যে, Faber and Faber প্রকাশন সংস্থা থেকে তাঁর দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। দুটিই ভারতীয় ধর্মবাণীর অনুবাদ সংকলন - (i) Thoughts for Meditation (ii) Testament of Immortality.

এলিয়ট তখন এই প্রতিষ্ঠানের একজন ডিরেক্টর। ১৯২৪ সাল থেকে আমরণ তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। এফ.ডি. মর্লের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে যে, প্রত্যেক ডিরেকটরকেই কয়েকজন লেখকের সঙ্গে প্রত্যহ দেখাসাক্ষাৎ করতে হত। ধীর, স্থির,

প্রাজ্ঞ, সহিষ্ণু ও আন্তরিক স্বভাবের জন্যে আরও বেশি সংখ্যক লোকের সঙ্গে দেখা করতে হত এলিয়টকে। তথ্য ইঙ্গিত দিচ্ছে, রবীন্দ্রজামাতা অবশ্যই এলিয়টের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কারণ এ 'দুটি-বইয়েরই ভূমিকা লিখেছিলেন টি এস এলিয়ট।'[১১] যদি তাই হয়ে থাকে, তবে নগেন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্ববিখ্যাত নোবেলবিজয়ী শ্বশুর মহাশয়ের উল্লেখ, সাক্ষাতের ক্ষেত্রে হয়তো কাজে লাগাবেন, এমন একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি সত্ত্বেও থেকেই যায়। অপরপক্ষে নগেন্দ্রনাথের বইয়ের ভূমিকা লেখবার পূর্বে তাঁর এ হেন উল্লেখযোগ্য পারিবারিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে এলিয়ট একটুও অবহিত হবেন না, এ সম্ভব বলে মনে হয় না আমাদের।

বিকাশ চক্রবর্তীর আলোচিত প্রবন্ধে পাউন্ডের কথাও আছে। কিন্তু আমরা এ বিষয়টি নিয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা করতে চাই। ১৯১২ সালের ২-রা অক্টোবর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হবার পর, ১৯১৩-র বিভিন্ন সময়ে পাউন্ড তিনটি পত্রিকায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনা লেখেন। এই সব আলোচনা অগোছালো, অগভীর ও চটকপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ইংরিজি সাহিত্যে রবীন্দ্র-চর্চার ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ :

ক. Fortnightly Review, মার্চ, ১৯১৩ - Rabindranath Tagore.

খ. New Freewoman, অক্টোবর, ১৯১৩ - The Gardener

গ. New Freewoman, নভেম্বর, ১৯১৩ - Tagore's Second Book into English.

ঘ. Poetry, ডিসেম্বর, ১৯১৩ - Tagore's Poem

রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে শেষ প্রবন্ধটি লেখবার মাত্র নয় মাস পরে, ১৯১৪-র সেপ্টেম্বর মাসে এলিয়টের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় পাউন্ডের। তখন রবীন্দ্রনাথ সবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এবং পাউন্ডের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের উত্তাপ অতোটা জুড়িয়ে আসেনি। এছাড়া রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পাউন্ডের একটি স্কেচধর্মী ব্যঙ্গাত্মক রচনাও আছে, Jodindranath Mawhor's

Occupation ; এটি ১৯১৭-এ, অর্থাৎ এলিয়টের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবার বছরে, Little Review, May, 1917 সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অতোদিনে পাউন্ডের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক শীতল হতে শুরু করেছে। ১৯১৭-র পর থেকে পাউন্ড রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দূরত্ব অনুভব করেছিলেন। তাঁর 'সাহিত্যিক অভিভাবক' এজরা পাউন্ডের মনোজগতের এইসব ক্রিয়া-বিক্রিয়ার খবরাখবর এলিয়টের পক্ষে রাখাটাই স্বাভাবিক। এলিয়ট নিজেও ছিলেন সাহিত্য সমালোচক। সুতরাং পাউন্ডের রবীন্দ্র-সমালোচনার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল, এমন মনে করা অসঙ্গত হবে না। বিশেষত Literary Essays of Ezra Pound তিনি ভূমিকা রচনা সহ সম্পাদনাও করেছিলেন। তবু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এলিয়ট নীরব। এ-বিষয়ে তাঁর কোনো প্রকাশ্য বিবৃতি বা প্রতিক্রিয়ার হদিশ আমরা পাইনি। এই সব তথ্য ও ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর মনে হয়, এলিয়টের এ ছিল 'সযত্ন-নীরবতা'। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এলিয়ট সম্পর্কে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েছেন একাধিক ক্ষেত্রে।

আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, বাংলায় এলিয়ট-চর্চার স্বর্ণযুগ হল ১৯২৮-৩১। এর আগে রবীন্দ্রনাথ এলিয়ট সম্পর্কে কখনো আগ্রহী হয়েছিলেন এমন প্রমান না থাকলেও, এই আধুনিক ইংরেজ কবি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মুখ খুলতে শুরু করেন বাংলায় এলিয়ট-চর্চার প্রায় স্বর্ণযুগেই, ইংরিজির ১৯৩২ সালে। এলিয়ট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন প্রতিক্রিয়ার কিছুটা প্রকাশ আমরা লক্ষ করেছি 'পরিচয়' বৈশাখ, ১৩৩৯-এ প্রকাশিত 'আধুনিক কাব্য' শীর্ষক মূল্যবান প্রবন্ধে। এরপর কবি অমিয় চক্রবর্তীর অনুপ্রেরণায় ও বিষ্ণু দে-র প্ররোচনায় তাঁর পক্ষে যতটুকু সম্ভব, এলিয়ট চর্চা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ — তাঁর বই-পত্রের খোঁজ-খবর রাখতেন, তাঁর সাহিত্য ও সাহিত্যাদর্শ বিষয়ে চিন্তা করতেন তিনি। এলিয়টের কাব্যগ্রন্থ (লক্ষণীয়, বিচ্ছিন্ন কিছু কবিতা নয়) ও কাব্যনাট্য যে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছিলেন তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। বিশেষ করে অমিয় চক্রবর্তীর মাধ্যমে এলিয়টের বই সংগ্রহ করতেন তিনি। তাঁর মাধ্যমেই এলিয়ট সম্পর্কে কিছু কিছু সাম্প্রতিক জীবন্ত খবর রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছত। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ এলিয়টের 'The waste Land'-ও পাঠ করেছিলেন। এমন

কি এলিয়ট সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ক্রমশ নরম হয়ে এসেছিল। এই সব মন্তব্যের সমর্থনে আমরা রবীন্দ্রনাথকে লেখা অমিয় চক্রবর্তীর পত্রাবলির বিচ্ছিন্ন কিছু পংক্তি দাখিল করতে চাই। এই চিঠিগুলি নরেশ গুহের সম্পাদনায় ভূমিকা ও টীকাসহ 'কবির চিঠি কবিকে' এই নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী পাঠক প্রয়োজনে সম্পূর্ণ অংশ দেখে নিতে পারেন। এই সূত্রে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিঠিপত্র', ১১ পর্বের কিছু-কিছু অংশও এখানে উদ্ধৃত হবে।

১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসের ঘটনা। এলিয়টের কাব্যনাটক 'The Family Reunion' সম্পর্কে মতামত জানতে চেয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী :

> 'Family Reunion' আপনার কেমন লাগে জানতে উৎসুক থাকব।[১২]
>
> (চিঠির তারিখ : ১২.৪.৩২)

এর পরের মাসেই রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে তাঁকে জানাচ্ছেন :

> 'Family Reunion' বইখানি গভীরভাবে ভালো লেগেছে। যদি মন স্থির করতে পারি পরে তোমাকে কিছু লিখব।[১৩]
>
> (চিঠির তারিখ : ৮.৫.৩২)

অমিয় চক্রবর্তীর চিঠির সূত্রেই আমরা জানতে পারি যে এলিয়টের বই পাঠানোর পর সে বিষয়ে মতামত জানবার জন্যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে রীতিমতো তাগাদা দিতেন :

> 'Eliot' -এর বই সম্বন্ধে একখানি চিঠি আমার পাওনা আছে।[১৪]
>
> (চিঠির তারিখ : ১০.৭.৩২)

১৯৩৫-এ লেখা এক চিঠিতে দেখি, বিদেশ থেকে অমিয় চক্রবর্তী এলিয়ট বিষয়ে কিছু টাটকা খবর রবীন্দ্রনাথকে পরিবেশন করছেন। এইসূত্রে জানা যাচ্ছে, পড়ুন কি না পড়ুন, রবীন্দ্রনাথ এলিয়টের বিখ্যাত কাব্যনাট্য 'Murder in the Cathedral' (1935) সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এলিয়টের এ নাটক প্রকাশিত হবার বছরেই চিঠিটি লেখা, এও আমরা লক্ষ করব। উদ্ধৃতির আরম্ভাংশ থেকে এটুকু আন্দাজ করে নেওয়াও

সহজ যে Eliot রবীন্দ্রনাথের কাছে অপরিচিত নয়, অতি পরিচিত এক ব্যক্তিত্বের নাম :

> Eliot -এর সঙ্গে সেদিন সভায় তর্কবিতর্ক হল - তিনি 'Pure Poetry' র সন্ধানে সমস্ত জীবনকে অস্বীকার করতে চান। ... Eliot -এর নূতন Drama "Murder in the Cathedral" এও Chorus গুলিতে জীবনের বিচিত্র সুরকে তিনি ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি।[১৫]
>
> (চিঠির তারিখ : ২৩.৭.৩৫)

এবার আমরা রবীন্দ্র অংশ খনন করে দেখতে চাই সেখান থেকে এ বিষয়ে কি-কি তথ্য সংগৃহীত হয়। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একাধিক চিঠিতে এলিয়টের প্রসঙ্গ আছে :

ক. ... বর্তমান ইংরেজি কাব্য উদ্ধতভাবে নূতন, পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীভাবে নূতন, ... এ যেন অনাবৃষ্টির যুগ। ঘরুতে যে গাছ ওঠে তার টেক্‌নিক কাঁটার টেক্‌নিক্ ...[১৬]

(চিঠির তারিখ : ৬.১.৩৫)

খ. আমার বড়ো বড়ো বহরের চিঠি দেখে মনে কোরো না আমার অবকাশের Waste Land বুঝি বহু বিস্তৃত[১৭]

(চিঠির তারিখ : ২৩.২.৩৯)

গ. তেমনি আমাদের দেশে হাল আমলের কাব্য, যাকে আমরা আধুনিক বলচি যদি দেখি তার দেহরূপটাই অন্য দেহরূপের প্রতিকৃতি তাহলে তাকে সাহিত্যিক জীবসমাজে নেব কী করে ? যে কবিদের কাব্যরূপ অভিব্যক্তির প্রাণিক নিয়ম পথে চলেছে তাঁদের রচনার স্বভাব আধুনিকও হতে পারে সনাতনীও হতে পারে অথবা উভয়ই হতে পারে, কিন্তু তার চেহারাটা হবে তাঁদেরই, সে কখনোই এলিয়টের বা অডিনের বা এজরা

পাউণ্ডের ছাঁচে ঢালাই করা হতেই পারে না।[১৮]

(চিঠির তারিখ : ২৩.২.৩১)

এবার বিচার বিশ্লেষণে আশা যাক। অত্যন্ত আলগা নজরে দেখলেও, উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকে আমরা আবিষ্কার করতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ এলিয়টের 'The waste Land' কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যকভাবে আলোকিত ছিলেন। এমন-কি উদ্ধৃতি ক-এর, 'মরুতে যে গাছ ওঠে তার টেক্‌নিক্ কাঁটার টেক্‌নিক্', এই অংশ, এলিয়টের অপর এক বিখ্যাত কবিতার অনুষঙ্গকে স্মরণ করিয়ে দেয়, 'The Hollow Men',

This is the dead land

This is the cactus land ....

মনে রাখতে হবে আলোচ্য উদ্ধৃতির কোনোটিই সচেতন ভাবে লিখিত প্রবন্ধের কোনো অংশ নয়, সবই পত্রাংশ। সুতরাং এলিয়ট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ের এতোরকম স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি ও প্রতিক্রিয়ার সবই, লোকমুখে আহরিত অপ্রত্যক্ষ-জ্ঞান-সম্ভূত, এমন মনে করা সঙ্গত নয় সম্ভবত। শেষ উদ্ধৃতিতে আমরা দেখছি গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাংলা আধুনিক কবিতার আদলের সঙ্গে 'এলিয়টের বা অডিনের বা এজরা পাউণ্ডের' কবিতার ছাঁচের তুলনা করে, নিজের বিচার অনুসারে, একটা সিদ্ধান্ত টানবার চেষ্টা করছেন। একি দুই ছাঁদ সম্পর্কে একেবারে ধারণাবিহীন অবস্থায় সম্ভব ? রবীন্দ্রনাথ এলিয়টের ক'টি কবিতা, কাব্যগ্রন্থ বা প্রবন্ধাদি পাঠ করেছিলেন এ বিষয়ে খনন-কার্যের পরিশ্রম তৃপ্তিদায়ক হলেও, অতোটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। রবীন্দ্রনাথ আসলে এলিয়ট ঘরানার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন অনেক আগে থেকেই। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত 'The Gardener' গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে পাউন্ড রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে ইমেজিস্ট আন্দোলনের সমর্থন খুঁজে পেয়েছিলেন। তখন পাউন্ড Imagism নিয়ে মেতে আছেন এবং এলিয়ট তাঁর পরিচিতির জগতে অবর্তমান। কাজেই যে স্কুলিং মেনে নিয়ে এলিয়ট আধুনিক ইংরিজি কবিতার উদ্বোধন ঘটালেন তা রবীন্দ্রনাথের জানা ছিল কিন্তু তাঁর কাছে তা

গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। পাউন্ডের সঙ্গে তাঁর মানসিক দূরত্ব তৈরি হবার এটাও ছিল একটা কারণ। প্রথম দিকে আধুনিকতার ধারণা সম্পর্কে তাঁর মনে কিছু দ্বিধা দ্বন্দ্বের টানা-পোড়েন ছিল ঠিকই, কিন্তু ক্রমশ তিনি তা কাটিয়ে উঠছিলেন। ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে আসছিল তাঁর চিন্তার অস্পষ্টতা, খুলে যাচ্ছিল জট। নতুন আধুনিকতাকে বুঝবার প্রতিক্রিয়ায় অবচেতনে ঘটে চলছিল কিছু পরিবর্তন। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা অনেক চিঠিতে এ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অকপট প্রকাশ লক্ষ করা গেছে। এভাবে দেশি - বিদেশি আধুনিক কবিতা সংক্রান্ত নানা আন্দোলনের অভিঘাতে শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথও নিজেকে নতুন করে সাজিয়ে নিচ্ছিলেন। নিজেকে যথেষ্ট আধুনিক করে তোলা গেল কিনা, 'জীবনের শেষ বছর-পনের রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই কমপ্লেক্স কাজ করেছে মাঝে মাঝেই।'[১৯] আর আধুনিক কথন-ভঙ্গিটি চয়ন করবার চেষ্টা চালিয়েছেন তিনি ক্রমশ। সহানুভূতির সঙ্গে স্বীকৃতি দিয়েছেন এলিয়টের Impersonalisation তত্ত্বকে :

> একেই বলা যায় নৈর্ব্যক্তিক, impersonal ঐ চটি জুতোর মালার উপর বিশেষ আসক্তির কোনো কারণ নেই ... কিন্তু, দাঁড়িয়ে দেখতে হল, সমস্ত ছবির একটা আত্মতা যেই ফুটে উঠল অমনি তার তুচ্ছতা আর রইল না। ... কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা। এইজন্যে কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়, অলংকারের উপর নয়। কেননা, অলংকারটা ব্যক্তির নিজেরই রুচিকে প্রকাশ করে, খাঁটি বাস্তবতার জোর হচ্ছে বিষয়ের নিজের প্রকাশের জন্যে।[২০]

কাজেই বিংশ শতাব্দীর উপযোগী কবিতা লেখবার প্রয়াসে, বাস্তবতার খাতিরে, শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যেও objectivity -কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। 'পুনশ্চ'(১৯৩২), 'নবজাতক'(১৯৪০) কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায় তার ছাপ উজ্জ্বল। বিশেষ করে 'পুনশ্চ'-এ Impersonalisation তত্ত্ব এতোটাই গুরুত্ব পেয়েছে যে

এলিয়টের কবিতার মতো এখানেও আমরা অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন persona -র দেখা পেয়েছি। সৌন্দর্য চেতনার রোমান্টিক কবি হওয়া সত্ত্বেও, শেষ বয়সের অনেক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যথাসম্ভব অলংকার বাহুল্য খসিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁর কাব্য-শরীর থেকে। জীবনের শেষ পর্যায়ে, ১৯৩২ থেকেই, আধুনিক জীবনের রূঢ়তা, কদর্যতা, বাস্তবতা ও কঠোর সত্যকে তিনি স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছিলেন কাব্য-রচনার ক্ষেত্রেও। এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে রবীন্দ্রমানসে আধুনিকতার সন্ধানে যদি আমরা তাঁর শেষ পর্যায়ের ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও চিত্রাঙ্কন ইত্যাদিকে ঘিরে খনন-কার্য চালাই, তাহলে তাঁকে আধুনিকের চেয়েও আধুনিক বলে মনে হতে পারে। দুঃখের বিষয় সে সুযোগ এখানে নেই। তবে এ কিন্তু কিছুতেই সত্যি নয়, যে রবীন্দ্র কবিমানসে এইসব বদল ঘটে চলছিল এলিয়টের দূরসঞ্চারী পরোক্ষ প্রভাবে। এ আসলে ঘরে-বাইরের বিভিন্ন ঘটনা ও আন্দোলনের অভিঘাতের ফল। এলিয়ট তার ক্ষুদ্র এক গুণনীয়ক মাত্র। এ গেল টেক্‌নিকের দিক, বিষয় আহরণের দিক। কিন্তু জীবনবোধের ক্ষেত্রে আপন সত্তাকে কখনো বিসর্জন দিতে চাননি কবিগুরু। শেষ বয়সে আধুনিক জীবনের কুৎসিত-কদর্য চিত্রের বর্ণনাতেও সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল না, কিন্তু পূর্ণতাবাদী, আনন্দবাদী 'স্বাস্থ্যের কবি' রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কদর্যতা ও নাস্তিক্যবাদকেই জগতে শেষ সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়ায় ঘোরতর আপত্তি ছিল। এই খানেই এলিয়ট হলেন এলিয়ট, এবং রবীন্দ্রনাথ হয়ে রইলেন রবীন্দ্রনাথ। তবু জীবনবোধের দিক থেকে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করলেও, এলিয়টের একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা অনুবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই প্রসঙ্গের আলোচনা করেই আমরা এ নিবন্ধের ইতি টানতে চাই।

তবে এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে যে কবিকে তিনি হলেন বিষ্ণু দে। বিষ্ণু দে-ই প্রথম, যিনি এতো বেশি সংখ্যক এলিয়টের কবিতা অনুবাদ করেছেন যে তা নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ বই বার করা সম্ভব হয়েছে। আর বিষ্ণু দে-ই সেই কবি, যাঁর প্ররোচনায় রবীন্দ্রনাথ-ও এলিয়টের পূর্ণাঙ্গ একটি কবিতা অনুবাদ না করে পারেননি।

এই অনুবাদের পেছনে একটা কৌতূকময় ইতিহাস আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মূল্যবোধাশ্রিত রবীন্দ্রনাথ তখন পরবর্তী আধুনিকতাকে নানা ভাষায় তিরস্কার করছেন কখনো বা। 'সাহিত্যের পথে'(১৯৩৬) বইয়ের 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে 'হালের কাব্য' বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এলিয়টের একেবারে প্রথম দিকের কবিতা Preludes থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং তার খানিকটা অংশ অনুবাদ-ও করেছেন তিনি। এই প্রবন্ধের রচনাকাল ১৩৩১ বঙ্গাব্দ। এই প্রবন্ধেরই অন্য এক জায়গায় আলোচনার খাতিরে রবীন্দ্রনাথ সারাংশ তুলে দিয়েছেন এলিয়টের আদিপর্বের 'Aunt Helen' কবিতার। 'পরিচয়' পত্রিকার বৈশাখ ১৩৩১ সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের এ আলোচনায় কিছুটা তিরস্কার ও ব্যঙ্গের আঁচ ছিল (যদিও সহানুভূতিও ছিল)। সে আঁচ বোধহয় বিষ্ণু দে-কে কিছুটা আহত করে থাকবে। তাই তরুণ কবি বিষ্ণু দে কিছুটা বয়স-চাঞ্চল্যেই এলিয়টের সদ্য প্রকাশিত Ariel Poems-এর অন্তর্গত Journey of the Magi (1927) কবিতাটি তর্জমা করে, এটি যে আসলে তর্জমা সে কথা না জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে পাঠান। এই অনুরোধ করেন যে রবীন্দ্রনাথ যেন গদ্যছন্দের শর্ত মেনে কবিতাটিকে অন্যভাবে আর একবার লেখেন। রবীন্দ্রনাথ সে অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন আর তারপরই সে সময়ের 'পরিচয়'-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ পরিহাস করে রবীন্দ্রনাথকে জানান, বিষ্ণু দে ছল করে কবিকে এলিয়টের সাম্প্রতিক কবিতার সঙ্গে পরিচিত করালেন। শেষে রবীন্দ্রনাথও মানতে বাধ্য হয়েছিলেন যে এলিয়ট লেখে ভাল। এ সবই ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ঘটনা। ইংরিজি বিচারে সময়টা ১৯৩২-এর এপ্রিল-মে মাস।[২১]

সুতরাং বাংলায় এলিয়ট-অনুবাদের আদি কাল হিসেবে যেমন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ তেমনি আদি অনুবাদক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে দু'জনেই বিশেষ মর্যাদা পাবার যোগ্য। বিষ্ণু দে সম্পর্কে অনেক আলোচনার সুযোগ আছে করতেও হবে। তাই আগে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ সেরে নেওয়া ভাল।

আগেই বলা হয়েছে 'মডার্ন্ বিলিটি' কবিদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কিছুটা ব্যঙ্গপূর্ণ মনোভাব ছিল। তার এঁদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব পরিষ্কার করে বোঝাতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ এলিয়টের Preludes কবিতার অংশ বিশেষ অনুবাদ করেছিলেন। সুতরাং এই অনুবাদের পেছনে কবিমানসের তেমন গভীর তৃষ্ণা তেমোটা কাজ করেনি বলাই বাহুল্য। তবু অনুবাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে অন্যের পোষাক নিজের গায়ে দিলে যেমন একটা অস্বস্তির ভাব হয়, সেই অবস্থা থেকে মুক্তি পান নি অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ। কবির অনুবাদে চকিতে যেন এলিয়টকে সরিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঢুকে পড়ছেন অবচেতনার নির্দেশে, এমন কি এলিয়টের প্রতি মৃদু ব্যঙ্গ প্রকাশ করতে গিয়েও। দুজনের কবিতা পাশাপাশি রেখে একটু বিচার করে দেখা যেতে পারে।

The winter evening settles down
With smeel of steak in passage ways
Six O' clock.
The burnt-out ends of smoky days.
And now a gusty shower wraps
The grimy Scraps
Of withered leaves about your feet
And newspapers from vacant lots;
The shower beat
On broken blinds and chimney-pots.
And at the corner of the street
A lonely Cab-horse steams and stamps.

(T.S. Eliot : Preludes)

রবীন্দ্রনাথ এই অংশের অনুবাদ করেছেন -

এ ঘরে ও ঘরে যাবার রাস্তায় সিদ্ধ মাংসের গন্ধ,
তাই নিয়ে শীতের সন্ধ্যা জমে এল।
এখন ছ'টা -
ধোঁয়াটে দিন, পোড়া বাতি, শেষ অংশে ঠেকল।
বাদলের হাওয়া পায়ের কাছে উড়িয়ে আনে
পোড়ো জমি থেকে ঝুলঝাখা শুকনো পাতা
আর ছেঁড়া খবরের কাগজ।
ভাঙা শার্সি আর চিমনির চোঙের উপর
বৃষ্টির ঝাপট লাগে,
আর রাস্তার কোণে একা দাঁড়িয়ে এক ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়া -
ভাপ উঠছে তার গা দিয়ে আর সে মাটিতে ঠুকছে খুর।

এলিয়ট ও রবীন্দ্রনাথের কবিমানসেই এক স্বাভাবিক পার্থক্য বর্তমান ছিল। লেখনভঙ্গীতে তো বটেই। তার চেয়ে বড় কথা এলিয়টের কাব্যাদর্শ রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষিত-ও ছিল না। ফলে তাঁর পক্ষে ঠিক-ঠিক এলিয়ট অনুবাদ করা কিছুটা কষ্ট সাধ্য, সে প্রমাণ এ অনুবাদে আমরা পাই। রবীন্দ্রকাব্যে আমরা লক্ষ করেছি, তিনি অপেক্ষাকৃত ছড়িয়ে, ব্যাখ্যা করে কথা বলতে ভালবাসেন। যেখানে এলিয়ট শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তীব্রভাবে সংযমী ও ব্যঞ্জনাপ্রেমী। তাই রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে, Passageways -এর মতো ছোট একটি শব্দ হয়ে যায়, 'এ ঘরে ও ঘরে যাবার রাস্তায়', কিংবা Cab-horse steams and stampsহয় 'এক ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়া - ভাপ উঠছে তার গা দিয়ে আর সে মাটিতে ঠুকছে খুর। 'Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English'-এ 'Steaks' শব্দের অর্থ লেখা আছে 'meat or fish for frying or grilling সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যখন ধাপ ডিঙিয়ে 'smeel of steaks -এর অনুবাদ করেন 'সিদ্ধ মাংসের গন্ধ' তখন আমরা সবিনয়ে বলব এক্ষেত্রে বিশ্বকবির ব্যাখ্যা করে কথা বলার প্রবণতা

কাজ করল হয়তো বা। আমরা সবিনয়ে আরও একটা কথা বলতে চাই, Vacant lots শব্দের অনুবাদ 'পোড়ো জমি' হয়তো 'Waste Land' -এর অনুষঙ্গেই এসে পড়েছে কবির কলমে, তা এক্ষেত্রে তেমন অনিবার্য ছিল না। অথবা একটু ভেবে দেখতে চাই 'The burnt-out ends of smoky days' -এর চমক অনেকটা কমে যায়নি কি, যখন রবীন্দ্রনাথ এই পংক্তির অনুবাদ করেন, 'ধোঁয়াটে দিন, পোড়া বাতি, শেষ অংশে ঠেকল।' সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে, 'The winter evening settles down' -এর বাংলা শুধু যথাযথ-ই নয়, অপূর্ব করেছেন রবীন্দ্রনাথ - 'শীতের সন্ধ্যা জমে এল।' তবে এ অনুবাদের যে অংশে এলিয়টকে সরিয়ে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি অনুপ্রবেশ করেছেন তা আয়তনে যতো ক্ষুদ্র-ই হোক, গুরুত্বপূর্ণ - 'The gusty shower হয়েছে, 'বাদলের হাওয়া।'

রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান খুঁটিয়ে না দেখলেও ধরা পড়বে বাদল শব্দের প্রতি কবিগুরুর বিশেষ দুর্বলতা আছে, 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল', 'বাদল-ধারা হল সারা', 'বাদল বাউল বাজায় রে একতারা', 'বাদল মেঘে মাদল বাজে', 'বাদল-শেষের আবেশ আছে ছুঁয়ে', 'বাদলের দানোয় পাওয়া অন্ধকারে' ইত্যাদি পংক্তিই তার প্রমাণ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকৃত Preludes অনুবাদের এই অংশ যতোটা না এলিয়টী তার চেয়ে বেশি রাবীন্দ্রিক হয়েছে একথা স্বীকার করতেই হবে। তাবলে তা দোষের কিছু নয়। অনুবাদের নেপথ্যে যে কবিও উপস্থিত থাকেন এ সত্য স্বীকার করে নিয়েই আমরা অনুবাদ কবিতা পড়তে বসি। অনুবাদে ঘটে দুই কবিব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বমীমাংসা।

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'তীর্থযাত্রী' (মাঘ ১৩৩২) বাংলায় এলিয়ট অনুবাদের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এ সম্পর্কে আগেই সামান্য কথা হয়েছে। অনুবাদ সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা শুরু করার আগে সবিনয়ে একটি ছোট্ট অসংগতির উল্লেখ করা যেতে পারে। কবিতার শিরোনামের তলায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'টি এস. এলিয়ট-এর 'The

Journey of the Magi' নামক কবিতার অনুবাদ', এলিয়টের মূল কবিতার নাম কিন্তু 'Journey of the Magi' রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদ কবিতাটির নামকরণ করেছেন 'তীর্থযাত্রী'। সাধারণ ভাবে রবীন্দ্রনাথের এ অনুবাদ মূলানুগ হয়েছে সর্বত্র, তবে শব্দ ব্যবহারে রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য যে এলিয়টী মেজাজকে আলগা করে তুলেছে অনেক সময়, তা অস্বীকার করবার নয়। তেতাল্লিশ পংক্তির ইংরিজি কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন ছেচল্লিশ পংক্তির। এক্ষেত্রে কেউ হয়তো বাংলা ভাষার স্বভাব শিথিলতার প্রসঙ্গ আনবেন। তাই যদি হবে তাহলে একই কবিতা বিষ্ণু দে-র কলমে 'রাজর্ষিদের যাত্রা' নামে অনূদিত হয়ে কিভাবে ঐ তেতাল্লিশ পংক্তির মধ্যেই অনেক বেশি এলিয়টী মেজাজ পায়! আসলে অকারণে অনেক ক্ষেত্রে বাড়তি শব্দ ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ, 'Weather sharp' -এর অনুবাদ করেছেন : 'ধারালো বাতাসের চোট' সেক্ষেত্রে বিষ্ণু দে 'ধারালো হাওয়া' লিখেই খামতে পেরেছিলেন। এই ধরণের উদাহরণ ইচ্ছে করলে আরও অনেক দেওয়া যায়। দুটো কবিতা পাশাপাশি রেখে বিচার করলে তা চোখেও পড়বে।

এলিয়টের কবিতার আঁটোসাঁটো ভাব রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে অনেক ঢিলে হয়ে গেছে আরও একটি কারণে, তা হল সমার্থমূলক শব্দ ব্যবহারের আধিক্য। যেমন রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে 'Lying down'হয়েছে, 'শুয়ে শুয়ে পড়ে', 'There were times we regretted' হয়েছে, 'মাঝে মাঝে মন যায় বিগড়ে, 'sleeping in snatches' হয়েছে 'মাঝে মাঝে নেব ঝিমিয়ে' ইত্যাদি। এছাড়াও এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় :

ক. আর কানে কানে কেউ বা গান গাবে,
খ. সেখানে বরফ-সীমার নীচেটা ভিজে ভিজে
গ. যেতে যেতে সন্ধ্যে হল,
ঘ. সময় পেরিয়ে যায় যায়,
ঙ. এলেম ফিরে আপন আপন দেশে,

চ· ঘন গাছগাছালির গন্ধ,

ছ· আর কিন্তু সুস্তি নেই সেই পুরানো বিধিবিধানে,

জ· যার মধ্যে আছে সব অনাত্মীয় আপন দেবদেবী আঁকড়ে ধ'রে।

- এই সব পংক্তিতে কবিগুরুর সমার্থপ্রবণ শব্দ ব্যবহারের বাহুল্য আমাদের চোখ ও কান এড়িয়ে যায় না।

'তীর্থযাত্রী' এলিয়টের 'Journey of the Magi' কবিতার মূলানুবাদ ঠিক-ই, তবু এলিয়টের কবিতার কাটা-কাটা ভঙ্গী ও তীক্ষ্ণতা অনুবাদে অনেক ক্ষেত্রে স্তিমিত ও দুর্বল হয়ে গেছে তা লক্ষ করবার বিষয়। এলিয়টের একটি পংক্তি ছিল - 'And feet kicking the empty wine - Skins ' - যার বাংলা করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'পা দিয়ে ঠেলছে শূন্য মদের কুপো'।'Kicking' যখন 'ঠেলছে' হয়ে যায় তখন তার তেমন জোর থাকে কি ? অন্য এক জায়গায় 'Six hands at an open door dicing for pieces of silver', 'তীর্থযাত্রী কবিতায় হয়েছে, 'দুজন মানুষ খোলা দরোজার কাছে পাশা খেলছে টাকার লোভে , - এক্ষেত্রে 'Six hands' 'কেন দুজন মানুষ' হয়েছে, এ ব্যাখ্যা আমাদের কাছে তেমন স্পষ্ট নয়, তবে তারা যে টাকার 'লোভে' পাশা খেলছে, এই কথা বুঝিয়ে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মূলের ব্যঞ্জনার ধার অনেক কমিয়ে দিয়েছেন তা কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই স্বীকার করব।

আমরা সকলেই জানি 'Journey of the Magi' কবিতাটিতে বাইবেলের অনুষঙ্গ বেশ প্রকট। The new Testament -এ যিশু-লিখিত সুসমাচারের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্বদেশীয় পন্ডিতদের উল্লেখ আছে, যাঁরা যীশুর জন্মের পর উটের পিঠে চেপে জেরুজালেমে এসেছিলেন ইহুদীদের নতুন রাজাকে সম্মান জানাতে। পূর্বদেশ থেকে একটি নক্ষত্র পথ দেখিয়ে এনেছিল তাদের। এই হল 'Journey of the Magi' -র আকর। এতে আধুনিক মাত্রা যোগ করে কবিতাটিকে আজকের করে তুলেছিলেন এলিয়ট, কিন্তু

বাইবেলের অনুষঙ্গ বজায় রাখতে ভাষাভঙ্গীতেও এক অপূর্ব কৌশল সচেতন ভাবেই ফলুর মতো বইয়ে দিয়েছিলেন কবি। আলোচনার সুবিধার্থে বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :

> Then he told them, "Go to Bethlehem and search for the child. And when you find him, come back and tell me so that I can go and worship him too ...."
>
> (Matthew : 2)

শুধু এই অংশে নয়, ইংরিজি বাইবেলের বহু জায়গায় বিশেষ করে Parable গুলিতে অবাক হয়ে লক্ষ করতে হয় 'And' শব্দের জুতসই বহুল ব্যবহার ভাষার মধ্যে কী অপূর্ব স্পন্দন জাগায়। এলিয়ট তাঁর কবিতায় বাইবেলের এই ভাষারীতিকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তাঁর কবিতায় 'And' এই সংযোজক অব্যয়টি অনিবার্য ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে চব্বিশবার. অথচ রবীন্দ্রনাথ যতদূর সম্ভব তা পরিহার করতে চেষ্টা করেছেন। কবিতার দৃশ্যরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আধুনিক কবিদের কাছে। সেক্ষেত্রেও এলিয়টের কবিতার একধার ঘেঁষা একটানা বিন্যাসকে অস্বীকার করে তাঁর অনুবাদ কবিতার পংক্তিগুলি এলোমেলো আল্পনার ঢঙে সাজিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভিন্নমনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। এই দুটি ক্ষেত্রে বিষ্ণু দে বরং অনেকটা সচেতন। তবে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের যে অংশকে ঘিরে বিভিন্ন সমালোচকের চাপা অভিমান লক্ষ করা যায় তা হল :

> Birth or Death ? There was a Birth certainly,

এই একটি পংক্তিকে রবীন্দ্রনাথ ভেঙে অনুবাদ করেছেন এই ভাবে :

> সে কি জন্মের সন্ধানে না মৃত্যুর।
> জন্ম একটা হয়েছিল বটে -

রবীন্দ্রনাথের ছড়িয়ে কথা বলার প্রবণতার প্রসঙ্গ এখানে আবার নতুন করে তুলছি না, এবং স্বীকার করে নিচ্ছি ইংরিজি হরফের টিপোগ্র্যাফিক্যাল সুবিধা নিয়ে এলিয়ট বড়ো হাতের

এবং ছোটো হাতের 'B' এবং 'D' ব্যবহার করে কবিতায় যে ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন তা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ভাষাগত কারণে সম্ভব ছিল না। তা বলে, 'There was a Birth Certainly'-র অনুবাদ 'জন্ম একটা হয়েছিল বটে'-কে কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি অনেক সমালোচক। তাদের যুক্তিকে অবহেলায় উড়িয়ে-ও দেওয়া যায় না। কারণ এ জন্ম তো সাধারণ কোনো জন্ম নয়। এই অদ্বিতীয় মহাজনমকে শ্রদ্ধা জানাতে পূর্বদেশ থেকে ছুটে এসেছেন Magi-রা। এই জন্মের সঙ্গে মিশে আছে যন্ত্রণাও। হাজার হাজার মৃত্যুর আর্তনাদ। রাজা হেরোদের বর্বরতায় হাজার হাজার সন্তানহীনা মায়ের কান্না। বাইবেলের এই গভীরতা ও গাম্ভীর্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদে আনতে পেরেছেন কই ?[২২]

তবে এ জন্য রবীন্দ্রনাথকে তেমন দোষ দেওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক অশ্রুকুমার সিকদারের একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে :

> ... অনুবাদের মধ্যে এমনভাবে এসে যায় অনুবাদকের আত্মপরিচয়। অর্জনার জন্য তিনি যে কবির কবিতাকে নির্বাচন করেন তার সঙ্গে কোথাও খুঁজে পান স্বভাবগত মিল, 'নিজেরই একটি সম্ভাবনার উন্মীলন', আর স্বভাবের এই সাদৃশ্যই আকৃষ্ট করে অনুবাদের কাজে। এই জন্যই বিষ্ণু দে এলিয়টের অর্জনা করেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র হুইটম্যানের, বুদ্ধদেব বসু বোদলেয়ারের। রেনাটো পোগ্‌গিওলি তাই সুন্দরভাবে বলেছেন কবির মতো অনুবাদকও নার্সিসাস ; কবি প্রকৃতির আয়নায় নিজেকে দেখেন, আর অনুবাদক নিজেকে দেখেন অন্যের রচিত শিল্পের দর্পণে।

অথচ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এলিয়টের কোনো স্বভাব-রুচি বা কাব্যাদর্শগত মিল তেমন ছিল না। বিচ্ছিন্নভাবে এলিয়টের কিছু লেখা তাঁর ভাল লাগলেও তিনি যে এলিয়টকে খুব বড় কবি মনে করতেন বা কবি হিসেবে তাঁকে খুব পছন্দ করতেন এ প্রমানও আমরা কোথাও পাইনি। তবু এলিয়টের একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছিলেন। বঙ্গ-ইঙ্গ সাহিত্যের

ইতিহাসে এ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কোনো এক প্রসঙ্গে তাঁর সম্পর্কে এক বিশেষ প্রবন্ধের লেখক রবীন্দ্রভক্ত আর·এফ·র‍্যাটরেকে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রসন্নচিত্তে জানান যে, I have translated — that was sometime ago — one of his lyrics called Journey of the Magi, — তখন তাঁর এ অনুবাদের উল্লেখযোগ্যতা যেন আরও অনেকটা বেড়ে যায়।

-: তথ্যপঞ্জি :-

১. জগন্নাথ চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ও এলিয়ট, সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত, এলিয়ট : শতবর্ষ পরে, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, আগস্ট, ১৯৮৯, পৃ.৭৫

২. ঐ

৩. ঐ

৪. বিকাশ চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথের এলিয়ট, প্রতিক্ষণ, সংস্কৃতি সংখ্যা, ১৩৯৫, পৃ.৪৯

৫. R.F.Rattray, Poets in the Flesh : Tagore, Yeats, Dunsany, Stephens, Orink water, Cambridge, 1961, p.3.

৬. বিকাশ চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথের এলিয়ট, প্রতিক্ষণ, সংস্কৃতি সংখ্যা, ১৩৯৫, পৃ.৫০

৭. T.S. Eliot, Charles Whibley, Selected Essays, 1986,p.492

৮. উদ্ধৃতিটি বিকাশ চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথের এলিয়ট' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

৯. বিকাশ চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথের এলিয়ট, প্রতিক্ষণ, সংস্কৃতি সংখ্যা, ১৩৯৫, পৃ.৫০

১০. ঐ

১১. ঐ

১২. নরেশ গুহ সম্পাদিত 'কবির চিঠি কবিকে' গ্রন্থের ৭৭ নং চিঠির অংশ, প্যাপিরাস, ১৯৯৫, পৃ.২৩১

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র ১১, বিশ্বভারতী ১৯৭৪, পৃ.২৭৬

১৪. নরেশ গুহ সম্পাদিত 'কবির চিঠি কবিকে' গ্রন্থের ৬৪ নং চিঠির অংশ, প্যাপিরাস, ১৯৯৫, পৃ.২৫০

১৫. ঐ, ৩৫ নং চিঠির অংশ, পৃ.১৫৮

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র ১১, বিশ্বভারতী ১৯৭৪, পৃ. ১৩৭ ও ১৩৮

১৭. ঐ, পৃ.২৩১

১৮. ঐ, পৃ.২৩৮

১৯. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, সময়বিশ্ব রবীন্দ্রনাথ, নবীন রাজা, আগস্ট, ১৯৮৮ পৃ.১৫১

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আধুনিক কাব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, মার্চ ১৯৮৯, পৃ.৫০১

২১. অমুকুমার সিকদার, বাক্যের সৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ১৯৮১ পৃ.৩২

২২. বীতশোক ভট্টাচার্য, তীর্থযাত্রী এলিয়ট, সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত, এলিয়ট : শতবর্ষ পরে, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, আগস্ট, ১৯৮৯, পৃ.৫৯